ঘিওর হাট আজ নাব্যতা হারানো এক নদী

হাসান নীল

এই গল্প আঠারো শতকের। তখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন চলে। ১৮৭২ সালে ভারত থেকে ঘি আগরওয়ালা নামের এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর আগমন ঘটে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জে। ভালোই চলছিল তার কারবার। কিন্তু ব্যবসায়ী মানুষ বাণিজ্যটা ষোল আনা বোঝেন। তিনি ভাবছিলেন এখানে একটি হাট হলে কারবার আরও জমে উঠত। কিন্তু তিনি ভিনদেশি মানুষ কিভাবে অচেনা জায়গায় নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করবেন। তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বললেন। তাদের বোঝালেন হাটের প্রয়োজনীয়তা। সেখানকার গণ্যমান্যরা মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর কথার গুরুত্ব বুঝলেন। ভাবলেন, খারাপ বলেননি ভিনদেশি বণিক। হাট বসানোর উদ্যোগ নিলেন তারা। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ধলেশ্বরী নদীর পাশে হাটের স্থান নির্ধারণ করা হয়।

হাট তো হলো কিন্তু হাটের নাম কি হবে? বিষয়টি নিয়ে সবাই যখন ভাবছিলেন। তখন ওই ঘি আগরওয়ালা হাটের নাম রাখলেন ঘিওর হাট। ঠিক এভাবেই আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর হাত ধরে মানিকগঞ্জের ধলেশ্বরী ও ইছামতী নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল ঘিওর হাট। শুরুতে মাত্র ৬/৭টি দোকান নিয়ে শুরু হয়েছিল হাটের। তবে চিত্র পাল্টাতে সময় লাগেনি। হাট হওয়ায় স্থানীয় মানুষদের যেমন সুবিধা হয়েছিল তেমনই বণিকদেরও বাণিজ্যের উপযুক্ত স্থান তৈরি হয়েছিল। স্থানীয়দের পাশাপাশি ভিনদেশি বণিকদের আনাগোনা ক্রমশ বাড়তে থাকে। হাটও বেশ জমে ওঠে। এত লোকের আসা যাওয়ায় অল্প দিনেই ঘিওর হাটের নাম ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে।

সেসময় চলাচলে জলপথই ছিল ভরসা। তাই বণিকরা দূর-দূরান্ত থেকে এ হাটে এসে নৌকা ভেড়াতেন ধলেশ্বরীর ঘাটে। শুরু থেকেই বুধবারে বসতো এ হাট। এদিন বণিক, হাটুরে নৌকা, মাঝি মাল্লার কলরবে সরগরম হয়ে উঠত ধলেশ্বরী ইছামতির পাড়। সময়ের সাথে সাথে এ হাটের নাম আরও ছড়াতে থাকে। সেইসঙ্গে বাড়তে থাকে ব্যবসায়ীদের আনাগোনা। এতটাই ভিড় হতো তখন যে হাটুরেদের নৌকা ভেড়ানোর জায়গা পাওয়াও মুশকিল হয়ে যেত। হাট সংলগ্ন কুস্তা বন্দরে স্টিমার, বড় বড় নৌকা এসে ভিড়তো। ধান, পাটসহ নানা দ্রব্য নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীরা বড় বড় ছান্দি নৌকা নিয়ে আসতো। কলকাতা থেকে বড় বড় বণিক আসতেন এ হাটে বাণিজ্য করতে। তারা আসতেন মূলত ডাল কিনতে। এখান থেকে হরেক রকম ডাল কিনে ভারতে বিক্রি করতেন তারা। শুধু ডালের জন্যই বিখ্যাত ছিল না এ হাট। গরু, পাট ও ধান বিক্রির জন্যও বিখ্যাত ছিল। পাশাপাশি গজারী কাঠ, পুরানো টিনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পাওয়া যেত এখানে। ছিল তেলের ঘানি, আটার কল ও চালের কল। নানাবিধ প্রয়োজনে এ হাটে আসতে

হতো মানুষকে। কলকাতার পাশাপাশি টাঙ্গাইল, ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা, চট্টগ্রামসহ আশেপাশের জেলাগুলো থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে ব্যবসা করতে আসতেন। দেশ বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবসায়ীরা এ হাটে নৌকা ভেড়ানোয় ছোটখাট নদীবন্দর বলে মনে হতো এ হাটকে।

১৯১৯ সালে ঘিওরকে ঘোষণা করা হয় প্রশাসনিক থানা হিসেবে। এর মাধ্যমে সে সময় থেকে এ হাটের প্রশাসনিক রেকর্ড শুরু হয়। ঘিওর হাটের জৌলুস তখন দিন দিন বেড়েই চলছিল। রাজস্ব খাতেও ভালো ভূমিকা পালন করছিল এটি। ঘিওর হাটের এই প্রসার লাভের আরও একটি কারণ হলো, শুরু থেকেই এ হাটে সব পাওয়া যায়। এছাড়া প্রতিটি পণ্য বিকিকিনির জন্য আলাদা জায়গা নির্ধারিত। গরু কিনতে যেতে হতো গরু হাটা, ধানের জন্য ধাইন্না (ধানের) হাট, ছাগলের জন্য ছাগল হাটা। একটা সময় প্রতি বুধবার গরু ছাগলসহ বিভিন্ন পণ্যে সয়লাব হয়ে যেত ঘিওর হাট। এমন কোনো জিনিস নেই যে পাওয়া যেত না। স্থানীয়রাও কোনো কিছু বেচাকেনার জন্য বুধবারের অপেক্ষায় থাকত। মানিকগঞ্জের আশেপাশের মানুষ এ হাটে এসে এক কাজে দুই কাজ সারতেন। তারা বুধবারে হাটে এসে প্রয়োজনীয় কাজ শেষে নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যেতেন। সেখানে একরাতের আতিথেয়তা গ্রহণ করে ফিরে যেতেন বাড়ি। বিষয়টা অনেকটা ছিল রথ দেখা কলা বেচার মতো। শোনা যায়, এই হাটে যাতায়াতের সুবিধার্থে দূর-দূরান্তের মানুষ ঘিওর অঞ্চলে আত্মীয়তা করতেও বেশ আগ্রহী ছিল। সেসময় আগে আগে হাটে পৌঁছানোর জন্য চলত প্রতিযোগিতা। অনেকে মঙ্গলবার রাতে এসেই বসে যেত হাট প্রাঙ্গনে। এদের সংখ্যাটা নেহায়েত কম ছিল না। মঙ্গলবার রাত থেকে ক্রেতারাও হাজির হওয়া শুরু করে হাটে। ফলে মঙ্গলবার রাত থেকেই শুরু হতে থাকে এ হাট।

ঘিওর হাটের ওপর নির্ভর করতো স্থানীয় অনেকের কর্মসংস্থান। দূর-দূরান্ত থেকে হাটুরেরা এসে রাত যাপন করায় আহারাদির জন্য তারা নির্ভর করত স্থানীয় হোটেলগুলোর ওপর। সেখানে গড়ে উঠেছিল ছোট বড় অনেক হোটেল। এসব হোটেলে বেচাকেনাও ছিল দেখার মতো। সবচেয়ে চাহিদা ছিল মিষ্টি ও রুটির। বুধবার এ হাটে ঘোষরা এত পরিমাণ মিষ্টি বানাতেন যে অবাক হতে হতো। দিন শেষে একটি মিষ্টি-রুটিও অবশিষ্ট থাকত না। কথিত আছে, ঘিওর হাটের এই মিষ্টি খাওয়ার লোভে মানুষ বেশে জ্বিন-পরীরও সমাগম হতো।

ঘিওর হাটের মিষ্টির সুনাম এখনও রয়েছে। এখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় মিষ্টি নিজামের মিষ্টি। অতুলনীয় স্বাদের এ মিষ্টির মধ্যে আবার সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন হচ্ছে মাওয়া মিষ্টি। নিজামের মিষ্টি ছাড়াও মিনিকেট, শাহী চমচম, মালাই চপ, আফলাতুন ছানা, সন্দেশ চকলেটসহ নানা ধরনের মিষ্টি পাওয়া যায় এ হাটে। শুধু মিষ্টিই না, ঘিওর হাটে গরুর খাঁটি দুধের চায়েরও যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। এছাড়া বাস স্ট্যান্ড এলাকার বিশেষ এক ধরনের সালাদসহ পরিবেশিত চটপটিও খেতে ভুলেন না এ হাটে আসা ক্রেতা বিক্রেতারা। সেইসঙ্গে পাওয়া যায় মুখোরোচক চানাচুর, নিমকি মিষ্টি জাতীয় খাবার ইত্যাদি। বাংলাদেশের বিখ্যাত ও পুরোনো হাটের মধ্যে একটি এই ঘিওর হাট। বয়স দুইশর কাছাকাছি।

তবে হাটের সেই সুদিন এখন আর নেই। সময় পরিক্রমায় জৌলুস হারিয়ে এখন অনেকটাই ন্যুজ এ হাট। পুরাতন গরু হাট, কাঠপট্টি, মাছবাজার, গুড় হাট, মিষ্টিপট্টি, বাস স্ট্যান্ড, ধানহাট, ভুসিপট্টি সবই আছে, নেই শুধু আগের যৌবন। সংস্কারের অভাব অনেকটা দায়ী এ জন্য। একটু বৃষ্টিতেই ভাসতে থাকে হাটের এই স্থানগুলো। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পানি নিষ্কাশনের ড্রেন নির্মাণ করা হলেও অল্পদিনেই তা ভরাট হয়ে যায়। তাই সমস্যার অবসান হয়নি। ঘিওর হাটে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রসার আজও প্রতি বুধবারে সেজে ওঠে। কিন্তু দূর-দূরান্ত থেকে হাটুরেরা আসে না। পাশাপাশি গরু ছাগলের হাট আজ হয়ে গেছে মৌসুমি। কেননা কোরবানি ঈদ ছাড়া এ হাটে গরু-ছাগল তেমন দেখা যায় না। তবে আশার কথা হলো ঘিওরের নৌকার হাট এখনও তার ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। বর্ষা মৌসুম এলে নৌকা হাটিতে সারি বেধে নৌকা সাজিয়ে বিক্রিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন বিক্রেতারা। ৩ কিলোমিটার বিস্তৃত এ হাটের আরও একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য ঝিটকার গুড়। মানিকগঞ্জে উৎপাদিত গুড়ের স্বাদে স্বকীয়তা রয়েছে। বুধবার হাটের দিন হাটুরেদের অনেকেই অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে ঝিটকার গুড় কিনে বাড়ি ফেরেন। নদী শুকিয়ে গেলেও যেমন চিহ্ন রেখে যায় তেমনই জৌলুস হারানো ঘিওর হাটের দশাও তাই। আজকাল মানুষ নিজেদের সুবিধায় গড়ে তুলেছে হাতের কাছেই হাট-বাজার দোকান। ফলে দূর-দূরান্তে তাদের আর যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। ঘিওর হাটের চাকচিক্য হারানোর এটিও একটি কারণ। তবে সে যাই হোক তবুও মরে যাওয়া নদী হয়ে বেঁচে আছে হাটটি। প্রয়োজন মেটাচ্ছে স্থানীয়দের।